।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, পুণ্যকর্ম (নিয়ত কর্ম, আরাধনা) করেন যাঁরা সেই যোগীগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সেই ব্যাপ্ত ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ কর্ম এমন যা' এই ব্যাপ্ত ব্রহ্মকে জানবার সুযোগ এনে দেয়। কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষগণ ব্যাপ্ত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, সম্পূর্ণ অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞসহিত আমাকে জানেন। অতএব কর্ম এই সমস্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এমনকি শেষ সময়েও তাঁরা আমাকেই জানেন। তাঁদের আমাকে জানা কখনও বিস্মৃত হয় না।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সেই শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে জিজ্ঞাসা করলেন–

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।। ১।।

হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈব কাকে বলে?

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।। ২।।

হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে এই দেহে অবস্থিত? প্রমাণিত হল যে, অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা কোন এমন পুরুষ, যে মনুষ্য শরীরের আধারযুক্ত। সমাহিত চিত্তযুক্ত পুরুষগণদ্বারা অন্ত সময়ে আপনি কিভাবে অবগত হন? এই সাতটি জিজ্ঞাসার ক্রমানুসারে সমাধান করবার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।। ৩।।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং'- যিনি অক্ষয়, যাঁর ক্ষয় হয় না, তাঁকেই পরব্রহ্ম বলে। **'স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে'**- স্বয়ং-এ স্থিরভাবই অধ্যাত্ম অর্থাৎ এটাই আত্মার আধিপত্য। এর পূর্বে সকলেই মায়ার আধিপত্যে অবস্থান করে; কিন্তু যখন 'স্ব'-ভাব অর্থাৎ স্বরূপে স্থির ভাব (স্বয়ং-এ স্থিরভাব) লাভ হয়, তখন আত্মার আধিপত্য তার উপর আরোপ হয়। এটাই অধ্যাত্ম এই হ'ল অধ্যাত্মের পরাকাষ্ঠা। **'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ'**- ভূতগণের সেই ভাব, যা' কিছু না কিছু উদ্ভব করে অর্থাৎ প্রাণীগণের সেইসব সঙ্কল্প, যা' ভাল অথবা মন্দ সংস্কারের রচনা করে, তাদের বিসর্গ অর্থাৎ বিসর্জন, সে সমস্ত বিলুপ্ত হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। এটাই সম্পূর্ণ কর্ম, যার জন্য যোগেশ্বর বলেছিলেন-'তিনি সম্পূর্ণ কর্মের জ্ঞাতা।' কর্ম তখনই সম্পূর্ণ হয়, এর পরে এর প্রয়োজন হয় না। (নিয়ত কর্ম) এই অবস্থাতে ভূতগণের সেই ভাবগুলি, যেগুলি কিছু না কিছু রচনা করতেই থাকে, ভাল অথবা মন্দ সংস্কার তৈরী করে, সে সমস্ত যখন সর্বথা শান্ত হয়, কর্ম তখন সম্পূর্ণ হয়। এর পরে আর কর্মের প্রয়োজন হয় না। অতএব কর্ম তা'ই যা' ভূতগণের সমস্ত সঙ্কল্পকে, যাদের দ্বারা কিছু না কিছু সংস্কারের সৃষ্টি হয়, শান্ত করে দেয়। কর্মের অর্থ (আরাধনা) চিন্তন, যা' যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।। ৪।।

যতক্ষণ অক্ষয়ভাব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ বিনাশশীল সম্পূর্ণ ক্ষরভাব 'অধিভূত' অর্থাৎ ভূতগণের অধিষ্ঠান। সম্পূর্ণ ক্ষরভাবই হ'ল ভূতগণের উৎপত্তির কারণ। **'পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্'**- প্রকৃতির ঊর্ধ্বে পরমপুরুষ স্থিত যিনি, তিনিই অধিদৈব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেবগণের (দৈবী সম্পদের) অধিষ্ঠাতা। দৈবী সম্পদ্ সেই পরমদেব-এ বিলীন হয়ে যায়। দেহধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! এই মনুষ্য দেহে আমিই 'অধিযজ্ঞ' অর্থাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। অতএব এই দেহে, অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত

মহাপুরুষই অধিযজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। যিনি সম্পূর্ণ যজ্ঞের ভোক্তা, অবশেষে যজ্ঞ তাতে সমাহিত হয়। সেই পরমস্বরূপ লাভ হয়। এইরূপে অর্জুনের ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করেছেন। এখন শেষ জিজ্ঞাসা যে, শেষ সময়ে কিভাবে আপনাকে জানতে পারা যায়, যে তার পরে আর কখনও বিস্মৃত হন না?

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। ৫।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যিনি মৃত্যুকালে অর্থাৎ নিরুদ্ধ মনের বিলীন হওয়ার সময় আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে পৃথক্ হয়ে যান, তিনি '**মদ্ভাবং**'- সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ লাভ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেহের বিনাশ শুদ্ধ অন্তকাল নয়। মৃত্যুর পরেও দেহের ক্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রারব্ধ ভোগ হয়ে গেলেই মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এবং যখন নিরুদ্ধ মনেরও বিলয় হয়, তখনই শেষসময়, যার পরে দেহ ধারণ করতে হয় না। এটা ক্রিয়াত্মক, কেবল শুনে, বার্তালাপে বোঝা সম্ভব নয়। যতক্ষণ বস্ত্রের মত দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ দেহের অন্ত কোথায় হ'ল? নিরুদ্ধ মন এবং যখন নিরুদ্ধ মনেরও বিলয় হয়, তখন দেহ থাকতেই দেহের সম্বন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি মৃত্যুর পরেই এই অবস্থা লাভ হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হতেন না। তিনি বলেছেন যে, বহু জন্মের অভ্যাসের পর প্রাপ্তিযুক্ত জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ হন। আমি তাঁতে এবং তিনি আমাতে স্থিত হন। তাঁতে ও আমাতে লেশমাত্রও পার্থক্য থাকে না। এটাই জীবিত থাকাকালীন প্রাপ্তি। যখন আর দেহধারণ করতে হয় না, তখন সেটাই দেহের শেষকাল।

এটা বাস্তবিক শরীরান্তের চিত্রণ, যার পরে আর জন্ম হয় না। অন্য শরীরান্ত মৃত্যু, যা' লোক-প্রচলিত; কিন্তু এই শরীরান্তের পর আবার জন্ম হয়—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬।।

কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাবে চিন্তন করতে করতে দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়। তাহলে তো খুব সোজা আদান-প্রদান, আজীবন

আনন্দ করে, মৃত্যুর সময় ভগবানের স্মরণ করে নিলেই হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এরূপ হয় না, '**সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ**'- সেই ভাবেরই চিন্তন করতে সমর্থ হন, যে ভাবের চিন্তন আজীবন করেছেন। আজীবন 'যা' চিন্তন করে এসেছেন, এরই মনের মধ্যে প্রতিফলন হয়। এর অন্যথা হয় না। অতএব–

তস্মাৎসর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যশংশয়ম্।।৭।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে। নিরন্তর চিন্তন এবং যুদ্ধ একসঙ্গে কিরূপে সম্ভব? নিরন্তর চিন্তন এবং যুদ্ধের স্বরূপ কি তাহলে এরূপ যে, 'জয় কনহৈয়া লাল কী', 'জয় ভগবান কী' বলে বলে শরসন্ধান করতে থাকবেন। কিন্তু স্মরণের স্বরূপ এর পরের শ্লোকে স্পষ্ট করে যোগেশ্বর বলছেন–

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।। ৮।।

হে পার্থ! সেই স্মরণের জন্য যোগাভ্যাসে যুক্ত হয় (আমার চিন্তন এবং যোগের অভ্যাস একে অন্যের পর্যায়) অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তন করতে করতে যোগী পরমপ্রকাশস্বরূপ দিব্যপুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন। মনে করুন এই পেন্সিলটি ভগবান, তাহলে এখন এটা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর স্মরণ উচিত নয়। এর আশে-পাশে যদি আপনি বই অথবা অন্য কিছু দেখতে পান, তাহলে আপনার স্মরণ খণ্ডিত হয়ে গেছে। স্মরণ যখন এইরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর স্মরণপর্যন্ত হয় না, মনে তরঙ্গও ওঠে না, তাহলে এখন কথা হল যে, স্মরণ এবং যুদ্ধ একসঙ্গে কি করে হবে? বস্তুতঃ যখন আপনি চিত্তকে সবদিক্ থেকে সংযত করে, নিজের একমাত্র আরাধ্যের স্মরণে প্রবৃত্ত হবেন, তখন মায়াময় প্রবৃত্তিরূপে কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ বাধারূপে উপস্থিত হবে। আপনি স্মরণ করে যাবেন, কিন্তু তারা আপনার অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি করবে, আপনার মনকে স্মরণ থেকে বিচলিত করবার চেষ্টা করবে। এই বাহ্য প্রবৃত্তিগুলির পারে যাওয়াই যুদ্ধ। নিরন্তর চিন্তনের সঙ্গেই যুদ্ধ সম্ভব। অর্থাৎ নিরন্তর চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকবার চেষ্টা

করে যাওয়াই যুদ্ধ। গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য জগতের যুদ্ধের সমর্থন করে না। চিন্তন কার করা হবে? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯।।

সেই যুদ্ধের সঙ্গে ঐ পুরুষ সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণ করেন যিনি, অচিন্ত্যস্বরূপ (যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ তাঁকে দর্শন করা সম্ভব নয়। যখন নিরুদ্ধ চিত্ত বিলীন হয়, তখনই তাঁকে জানা সম্ভব হয়), নিত্য প্রকাশস্বরূপ এবং অবিদ্যার অতীত সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন। পূর্বে বলেছেন—আমার চিন্তন করেন, এখানে বলছেন—পরমাত্মার। অতএব সেই পরমাত্মার চিন্তনের (ধ্যানের) মাধ্যম তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ। এই ক্রমেই-

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।। ১০।।

যিনি নিরন্তর সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন, সেই ভক্তিযুক্ত পুরুষ '**প্রয়াণকালে**'- মনের বিলয়কালে যোগবলে অর্থাৎ নিয়ত কর্মের আচরণ করে, ভ্রূ-যুগলের মধ্যে প্রাণ উত্তমরূপে স্থাপন করে (প্রাণ-অপানকে সম করে, অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি হবে না, বাহ্য সঙ্কল্পও গ্রহণ করা হবে না, সত্ত্ব, রজ ও তম উত্তম রূপে শান্ত হবে, স্মৃতি ইষ্টে স্থিত হবে, সেইকালে) সেই অচল মন অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি পুরুষ ঐ দিব্যপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেন। সতত স্মরণীয় যে, সেই একমাত্র পরমাত্মার প্রাপ্তির বিধান যোগ। তাঁর জন্য নিয়ত ক্রিয়ার আচরণই যোগক্রিয়া, যার সবিস্তার বর্ণনা যোগেশ্বর চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়ে করেছেন। এখন তিনি বলছেন, "নিরন্তর আমাকেই স্মরণ কর।" কিরূপে করা হবে? এই যোগ ধারণায় স্থির থেকে করতে হবে। যিনি এইরূপ কর্ম করেন, তিনি সেই দিব্যপুরুষকে লাভ করেন। যিনি আর কখনও বিস্মৃত হন না। এখানে এই জিজ্ঞাসার সমাধান হল যে, প্রয়াণকালে আপনাকে

কিরূপে জানা সম্ভব ? প্রাপ্তযোগ্য পদের চিত্রণ দেখুন, যার উল্লেখ গীতাশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে–

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সঙ্গ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।

'বেদবিদ্' অর্থাৎ অবিদিত তত্ত্বকে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানেন এবং যে পরমপদকে **'অক্ষরম্'**- অক্ষয় বলেন, বীতরাগ মহাত্মা যাতে প্রবেশের জন্য যত্নশীল এবং যে পরমপদ লাভ করবার জন্য ব্রহ্মচর্যের পালন করেন (ব্রহ্মচর্যের অর্থ কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের সংযম নয়, বরং **'ব্রহ্ম আচরতি স ব্রহ্মচারী'**- বাহ্য স্পর্শ মন থেকে ত্যাগ করে নিরন্তর ব্রহ্মের চিন্তন-স্মরণই ব্রহ্মচর্য। এরূপ আচরণে ব্রহ্মের দর্শন, তাঁতে স্থিতি এবং শান্তি লাভ হয়। এই আচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমই নয় বরং সকলেন্দ্রিয় সংযম স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যায়। যিনি এইরূপ ব্রহ্মের আচরণ করেন) , যা হৃদয়ে সংগ্রহের যোগ্য, ধারণের যোগ্য, সেই পরমপদের সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। সেই পদ কি ? কিরূপে লাভ হয় ? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মুর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে অর্থাৎ বাসনা থেকে পৃথক্ অবস্থান করে, মন হৃদয়ে স্থিত করে (ধ্যান হৃদয়েই করা হয়, বাইরে নয়। পূজা বাইরে হয় না) প্রাণ অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যাপারকে মস্তিষ্কে নিরুদ্ধ করে, যোগধারণাতে স্থিত হয়ে (যোগ ধারণ করতে হবে, অন্য উপায় নেই) এইরূপ স্থিত হয়ে–

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।

যে পুরুষ **'ওঁ ইতি'**- ওঁ কেবল, যা' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ এবং আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, সেই পুরুষ পরমগতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগেশ্বর, পরমতত্ত্বে স্থিত মহাপুরুষ, সদ্‌গুরু ছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, 'ওঁ' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, তুমি এর জপ কর এবং আমার ধ্যান কর। প্রাপ্তিযুক্ত প্রত্যেক মহাপুরুষের নাম সেই হয়, যা তাঁরা লাভ করেন, যাঁর মধ্যে তাঁরা বিলীন হন। সেই নাম ওঁ এবং রূপ নিজের বললেন। যোগেশ্বর 'কৃষ্ণ - কৃষ্ণ' জপ করবার নির্দেশ দেননি। কালান্তরে ভাবুকগণ তাঁর নাম জপ করতে শুরু করে দিয়েছেন এবং শ্রদ্ধা অনুসারে ফলও পেয়ে থাকেন; যেমন—মানুষের শ্রদ্ধা যেখানেই হয়, সেখানেই আমি তার শ্রদ্ধা স্থির করি এবং আমিই ফলের বিধানও করি।

ভগবান শিব 'রাম' নাম জপ করবার উপর জোর দিয়েছেন। **'রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ স রামঃ।', 'রা অওর ম কে বিচ মেঁ, কবিরা রহা লুকায়।'** রা ও ম এই দুই অক্ষরের অন্তরালে কবীর নিজের মনকে স্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ 'ওঁ' জপ করবার উপর জোর দিচ্ছেন। **'ও অহং স ওঁ'** অর্থাৎ ঐ সত্তা আমার মধ্যে আছেন, বাইরে খুঁজতে শুরু করে দেবেন না যেন। এই 'ওঁ' ও পরম সত্তার পরিচয় প্রদান করে শান্ত হয়ে যায়। বাস্তবে সেই প্রভুর নাম অনন্ত; কিন্তু জপ করবার জন্য সেই নাম সার্থক যা ছোট, শ্বাসে লীন হয়ে যায় এবং পরমাত্মা এক বোধ করিয়ে দেয়। তাঁকে ভুলে বহু দেবী-দেবতার অবিবেকপূর্ণ কল্পনাতে জড়িয়ে লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবেন না।

'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন- "আমার স্বরূপ-চিন্তন করবে এবং শ্রদ্ধা অনুসারে যে কোন দুই-আড়াই অক্ষরের নাম-'ওঁ', 'রাম', 'শিব' এদের মধ্যে থেকে একটা বেছে, তার চিন্তন এবং তারই অর্থস্বরূপ ইষ্টের স্বরূপের ধ্যান করবে।" ধ্যান সদ্‌গুরুদেবেরই করা হয়। আপনি রাম, কৃষ্ণ অথবা **'বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।'**- বীতরাগ মহাত্মাগণের অথবা **'যথাভিমতধ্যানাদ্বা।' (পাতঞ্জল যোগ০, ১/৩৭, ৩৯)** অভিমত অর্থাৎ যোগের অভিমত, অনুকূল কোন মহাপুরুষের স্বরূপের ধ্যান করুন, তিনি অনুভবে আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং আপনার সমকালীন কোন সদ্‌গুরুর দিকে এগিয়ে দেবেন, যাঁর মার্গদর্শনে আপনি ধীরে ধীরে প্রকৃতির ক্ষেত্রের পারে চলে যাবেন। আগে আমিও এক দেবতার (শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ) ছবির ধ্যান করতাম; কিন্তু পূজ্য মহারাজজীর ভাবধারায় প্রবাহিত হয়ে তা শান্ত হয়ে গেছে।

প্রারম্ভিক সাধক নাম-জপ করেন ঠিকই; কিন্তু মহাপুরুষের স্বরূপের ধ্যান করতে তাঁরা ইতস্ততঃ বোধ করেন। অর্জিত সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্য দেবতার ধ্যান করতে নিষেধ করেছেন। অতএব পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে কোন জ্ঞানী মহাপুরুষের শরণাগত হলেই। পুণ্য-পুরুষার্থ সবল হবে এবং কুতর্কগুলি শান্ত হবে যার ফলে যথার্থ ক্রিয়াতে প্রবেশ লাভ হবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে 'ওঁ'- জপ এবং পরমাত্মস্বরূপ সদ্‌গুরুর স্বরূপের নিরন্তর স্মরণ করলে মন নিরুদ্ধ এবং বিলীন হয়ে যায় এবং তৎক্ষণেই দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল মৃত্যু হলে দেহধারণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।

"আমা ব্যতীত কাউকে চিত্তে ঠাঁই দেন না"- অর্থাৎ অনন্য চিত্ত হয়ে যিনি নিরন্তর আমার স্মরণ করেন, সেই নিত্য আমাতে যুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য। আপনি সহজলভ্য হলে কি লাভ?—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।

আমাকে লাভ করলে তাঁদের দুঃখের স্থানস্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্ম হয় না, বরং পরমসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ আমাকে লাভ করা অথবা পরমসিদ্ধি লাভ করা একই কথা। কেবল তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না, যাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন। তাহলে পুনর্জন্মের সীমা কতদূর পর্যন্ত?—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। ১৬।।

অর্জুন! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যু হয় এবং পুনঃপুনঃ এই ক্রমেই চলতে থাকে; কিন্তু কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করলে সেই পুরুষের আর পুনর্জন্ম হয় না।

ধর্মগ্রন্থগুলিতে লোক-লোকান্তরের পরিকল্পনা ঈশ্বর-পথের বিভূতিগুলির বোধ করিয়ে দেয়, যা' হল আন্তরিক অনুভব। অন্তরিক্ষে এমন কোন গর্ত নেই

যেখানে কীট দংশন করে এবং এমন কোন প্রাসাদও নেই যাকে স্বর্গ বলা হয়। দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত পুরুষই দেবতা এবং আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত মানুষই অসুর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় কংস রাক্ষস এবং বানাসুর দৈত্য ছিল। দেব, মানব, তির্যক্‌ যোনিগুলিই হল বিভিন্ন লোক। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এই জীবাত্মা মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারসমূহের অনুরূপ নতুন দেহ ধারণ করে।

যে দেবতাদের অমর বলা হয়, তারাও মরণধর্মা- '**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**।' এর থেকে বেশী ক্ষতি কি হতে পারে? সেই দেবদেহে কি লাভ, যাতে সঞ্চিত পুণ্য শেষ হয়ে যায়? দেবলোক, পশুলোক, কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত লোক ভোগলোক মাত্র। কেবল মানুষই কর্মের রচয়িতা, যার দ্বারা সে পরমধামপর্যন্ত লাভ করতে সমর্থ হয়, যেখান থেকে পুনরাবর্তন হয় না। যথার্থ কর্মের আচরণ করে মানুষ দেবতা হোক অথবা ব্রহ্মার স্থিতিলাভ করুক; কিন্তু পুনর্জন্মের হাত থেতে ততক্ষণ রেহাই পায় না, যতক্ষণ মন নিরুদ্ধ না হয়, এবং বিলীন হয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে ঐ পরমভাব-এ স্থিত না হয়। উদাহরণার্থ উপনিষদও এই সত্যের উদ্‌ঘাটন করে–

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিস্থিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।। (কঠোo, ২/৩/১৪)

হৃদয়েস্থিত সমস্ত কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণধর্মা ব্যক্তি অমর হয়ে যায় এবং এখানে, এই সংসারেই, এই মনুষ্য দেহেই উত্তমরূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভব করে থাকেন।

প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে কি ব্রহ্মাও মরণধর্মা? তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রাপ্তির পরে বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়ে যায়। তাঁর মাধ্যমে পরমাত্মা ব্যক্ত হন। এরূপ মহাপুরুষগণ দ্বারাই যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এখানে বলছেন যে, ব্রহ্মার স্থিতিলাভ করেছেন যিনি, তিনিও প্রত্যাবর্তন করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন?

বস্তুতঃ যে মহাপুরুষগণের মাধ্যমে পরমাত্মা ব্যক্ত হন, সেই মহাপুরুষগণের বুদ্ধিও ব্রহ্মা নয়; কিন্তু উপদেশ দেন ও কল্যাণের সূত্রপাত করেন, সেইজন্য ব্রহ্মা

বলা হয়। তাঁরাও ব্রহ্মা নন। তাঁদের কাছে নিজের বুদ্ধি বলে কিছু থাকে না। কিন্তু এর পূর্বে সাধনাকালে বুদ্ধিই ব্রহ্মা- **'অহংকার শিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান।' (মানস, ৬/১৫ ক)**

সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ব্রহ্মা নয়। বুদ্ধি যখন ইষ্টে স্থিত হয়, তখনই ব্রহ্মার রচনা হয়, যার চারটি সোপান সম্বন্ধে মনীষীগণ বলেছেন। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, স্মরণের জন্য পুনরায় দেখতে পারেন- ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ সেই বুদ্ধিকে বলে, যা ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত। যিনি ব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্বর। ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ সেই বুদ্ধি, যার সাহায্যে পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাতে দক্ষতাই নয়, বরং তার নিয়ন্ত্রক, সঞ্চালক হয়ে যান। ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বুদ্ধির শেষ সীমা, যার মাধ্যমে ইষ্ট প্রবাহিত হন। বুদ্ধির অস্তিত্ব এতদূর পর্যন্তই, কারণ যে ইষ্ট প্রবাহিত হন তিনি ও গ্রহণকর্ত্তা বুদ্ধি এখনও পৃথক্ পৃথক্। এখনও তা প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপে যখন বুদ্ধি (ব্রহ্মা) থাকে, জাগ্রত থাকলে সম্পূর্ণ ভূত (চিন্তনের প্রবাহ) জাগ্রত থাকে এবং যখন অবিদ্যাতে থাকে, তখন অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। একেই প্রকাশ ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন বলে সম্বোধন করা হয়। দেখুন—

ব্রহ্মবিদ্বেতার সেই শ্রেণীকে ব্রহ্মা বলে, যার মধ্যে ইষ্টের ভাবধারা প্রবাহিত হয়, ইষ্ট লাভ করেও সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে বিদ্যার (যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ তাঁতে বিলীন করে) দিন এবং অবিদ্যার রাত্রি, প্রকাশ এবং অন্ধকারের ক্রম ক্রমাগত চলতে থাকে। এতদূরপর্যন্ত মায়া সাধকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রকাশকালে অচেতন ভূত সচেতন হয়ে যায়, লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বুদ্ধির অন্তরালে অবিদ্যার রাত্রির প্রবেশকালে সমস্ত ভূত অচৈতন্য হয়ে যায়। বুদ্ধি নিশ্চয করতে পারে না। স্বরূপের দিকে এগোনো বন্ধ হয়ে যায়। এটাই ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি। দিনের আলোয় বুদ্ধির হাজার হাজার প্রবৃত্তিগুলিতে ঈশ্বরীয় প্রকাশ অনুভব হয় এবং অবিদ্যার রাত্রিতে এই হাজার হাজার স্তরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থার অন্ধকার নেমে আসে।

শুভ এবং অশুভ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা—এই দুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ অচেতন এবং সচেতন, রাত্রিতে বিলীন এবং দিনে জেগে ওঠা দুই প্রকার ভূতেরই (সঙ্কল্প প্রবাহ) বিলীন হওয়ার পর সেই অব্যক্ত বুদ্ধিরও অতি

ঊর্ধ্বে শাশ্বত অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, যা আর কখনও নষ্ট হয় না। ভূতের অচেতন এবং সচেতন উভয় স্থিতিলোপ পেলেই সেই সনাতন ভাব প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধির উপর্যুক্ত চারটি অবস্থা পার করেই পুরুষ মহাপুরুষ হতে পারে। সেই মহাপুরুষের অন্তরালে বুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধি পরমাত্মার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায়; কিন্তু উপদেশ দেওয়ার জন্য, প্রেরণা দেওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে বুদ্ধির উপস্থিতি প্রতীত হয়। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির স্তরের ঊর্ধ্বে চলে যান। তাঁরা পরম অব্যক্ত ভাবে স্থিত হন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু এই অব্যক্ত স্থিতিলাভের আগে যতক্ষণ তাঁদের কাছে নিজ বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ তাঁরা ব্রহ্মা, ততক্ষণ তাঁরা পুনর্জন্মের পরিধির মধ্যে পড়েন। এই তথ্যগুলির উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।। ১৭।।

যাঁরা সহস্র চতুর্যুগের ব্রহ্মার রাত্রি এবং সহস্র চতুর্যুগের তার দিন সম্বন্ধে অবগত হন, সেই পুরুষগণ সময়ের তত্ত্ব যথার্থ জানেন।

প্রস্তুত শ্লোকে দিবা এবং রাত্রি, বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে বলা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যাসংযুক্ত বুদ্ধি ব্রহ্মার প্রবেশিকা এবং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বুদ্ধি ব্রহ্মার পরাকাষ্ঠা। বিদ্যাসংযুক্ত বুদ্ধিই হল ব্রহ্মার দিন। যখন বিদ্যা কার্যরত হয়, তখন যোগী স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, অন্তঃকরণের শত শত প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রকাশের সঞ্চার হয়। এইরূপ অবিদ্যার রাত্রির আগমনে অন্তঃকরণের হাজার হাজার প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মায়ার দ্বন্দ্ব প্রবাহিত হয়। প্রকাশ ও অন্ধকারের সীমা এতদূর পর্যন্তই। এর পরে না অবিদ্যা থাকে, না বিদ্যাই থাকে, তখনই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে জানতে পারা যায়। যিনি একে তত্ত্বতঃ উত্তমরূপে জানেন, সেই যোগী কালের তত্ত্বকে জানেন যে, কখন অবিদ্যার রাত্রি হয়? কখন বিদ্যার দিন উপস্থিত হয়? কালের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত অথবা সময়ের হাত থেকে কখন নিস্তার পাওয়া যায়?

প্রারম্ভিক মনীষীগণ অন্তঃকরণকে চিত্ত অথবা কখনও কখনও বুদ্ধি বলে সম্বোধন করেছিলেন। কালান্তরে অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার এই চারটি প্রমুখ বৃত্তিতে বিভাজন করা হয়েছে, যদিও অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অনন্ত। বুদ্ধির

অন্তরালেই অবিদ্যার রাত্রি বিদ্যমান এবং সেই বুদ্ধিতেই বিদ্যার দিনও বর্তমান। একেই ব্রহ্মার রাত্রি ও দিন বলে। জগৎরূপ রাত্রিতে সমস্ত জীব অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। প্রকৃতিতে ভ্রান্ত হয়ে তাদের বুদ্ধি সেই প্রকাশ স্বরূপকে দেখতে পায় না; কিন্তু যিনি যোগের আচরণ করেন, তিনি চেতনা লাভ করে স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান, যেমন গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিতমানসে লিখেছেন—

কবহুঁ দিবস মহঁ নিবিড়তম, কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।

বিনসই উপজই গ্যান জিমি, পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ।।

(রামচরিতমানস, ৪/১৫ খ)

বিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধি কুসঙ্গে পড়ে অবিদ্যাতে পরিণত হয়। পুনরায় সুসঙ্গলাভ করে সেই বুদ্ধিতেই বিদ্যার সঞ্চার হয়। এই উত্থান-পতন সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বুদ্ধি, ব্রহ্মা, রাত্রি, দিন কিছুই থাকে না। এই হল ব্রহ্মার দিবা-রাত্রির রূপক। হাজার হাজার বছর দীর্ঘরাত্রি হয় না, না হাজার হাজার চতুর্যুগের দিনই হয় এবং চারমুখযুক্ত কোন ব্রহ্মাও নেই। বুদ্ধির উপর্যুক্ত চারটি ক্রমিক অবস্থাই ব্রহ্মার চারটি মুখ এবং অন্তঃকরণের চারটি প্রমুখ প্রবৃত্তিই তার চতুর্যুগ। এই প্রবৃত্তিগুলিতেই রাত্রি ও দিন ঘটে থাকে। যাঁরা এই রহস্য সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অবগত, সেই যোগীগণ কালের রহস্য সম্বন্ধে অবগত যে, কালের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত এবং কোন পুরুষ কালের অতীত হন? দিবা এবং রাত্রি, বিদ্যা এবং অবিদ্যাতে কার্য ঘটে থাকে, তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করছেন-

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।। ১৮।।

ব্রহ্মার দিনের প্রবেশকালে অর্থাৎ বিদ্যা (দৈবী সম্পদ্‌) র প্রবেশকালে সমস্ত প্রাণী অব্যক্ত বুদ্ধিতে চেতনালাভ করে এবং রাত্রির প্রবেশকালে সেই অব্যক্ত, অদৃশ্য বুদ্ধিতে জাগ্রত সূক্ষ্মতত্ত্ব অচেতন হয়ে যায়। ঐ সমস্ত প্রাণী অবিদ্যার রাত্রিতে স্বরূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারে না; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। জাগ্রত হওয়া এবং অচেতন হওয়ার মাধ্যম এই বুদ্ধি, যা সকলের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান, দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।। ১৯।।

হে পার্থ! এইরূপ সমস্ত প্রাণী জাগ্রত হয়ে, প্রকৃতির বশীভূত হয়ে অবিদ্যারূপী রাত্রির সমাগমে অচেতন হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের লক্ষ্য কি? দিনের সমাগমে তারা পুনরায় জাগ্রত। যতক্ষণ বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ এর অন্তরালে বিদ্যা ও অবিদ্যার ক্রমে চলতে থাকে। ততক্ষণ সেই সাধক, মহাপুরুষ নয়।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।

এক তো ব্রহ্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং এর থেকেও পর সনাতন অব্যক্তভাব, যা সমস্ত ভূতের বিনাশ হলেও বিনাশ হয় না অর্থাৎ বিদ্যাতে সচেতন এবং অবিদ্যাতে অচেতন, দিনে উৎপন্ন এবং রাত্রিতে বিলীন ভাবযুক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মারও বিলীন হবার পরে সেই সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, যার বিনাশ হয় না। বুদ্ধিতে এই উঠা-পড়ার তরঙ্গ যখন শেষ হয়, তখন সনাতন অব্যক্ত প্রাপ্ত হয়, যা আমার পরমধাম। যখন সনাতন অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিও সেই ভাবে ভাবিত হয়, সেই ভাবকেই ধারণ করে। সেইজন্য বুদ্ধি বিলীন হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে সনাতন অব্যক্তভাব শুধু থাকে।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। ২১।।

সেই সনাতন অব্যক্ত ভাবকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী বলা হয়। একেই পরমগতি বলে। ঐ আমার পরমধাম, যা প্রাপ্ত হয়ে মানুষ ফিরে আসে না, তাদের পুনর্জন্ম হয় না। এই সনাতন অব্যক্তভাবের প্রাপ্তির উপায় বলছেন–

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।। ২২।।

পার্থ! যে পরমাত্মার অন্তর্গত সমস্ত ভূতগণ, যার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সনাতন অব্যক্ত ভাবযুক্ত সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। অনন্য ভক্তির তাৎপর্য হল, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্মরণ না করে তাঁর সঙ্গে

যুক্ত হওয়া। অনন্যভাবে সংযুক্ত পুরুষ কতক্ষণ পুনর্জন্মের সীমার মধ্যে থাকেন এবং কখন তাঁরা পুনর্জন্মের অতিক্রমণ করেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩।।

হে অর্জুন! যে কালে দেহত্যাগ করলে যোগীগণ পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং যে কালে দেহত্যাগ করলে পুনর্জন্ম লাভ করেন, এখন আমি সেই কালের কথা বলব।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪।।

দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করবার সময় যার সমক্ষে জ্যোতির্ময় অগ্নি প্রজ্বলিত, দিনের প্রকাশ বিদ্যমান, সূর্য উজ্জ্বলভাবে আকাশে বিরাজমান, শুক্লপক্ষের চন্দ্র ক্রমবর্দ্ধিত, উত্তরায়ণের নিরভ্র এবং সুন্দর আকাশ থাকে যখন, সেই কালে প্রয়াণ করলে ব্রহ্মবেত্তা যোগীগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

অগ্নি ব্রহ্মতেজের প্রতীক। দিন হল বিদ্যার প্রকাশ। শুক্লপক্ষ নির্মলতার দ্যোতক। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তেজ এবং প্রজ্ঞা এই সমস্ত ষড়ৈশ্বর্যকেই ষণ্মাস বলে। ঊর্দ্ধরেতা স্থিতিই হল উত্তরায়ণ। প্রকৃতি পারে এই অবস্থায় যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁরাই, ঐ ব্রহ্মবেত্তা যোগীগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু অনন্যচিত্ত যোগীগণ যদি এই জ্যোতিস্বরূপ লাভ না করতে পারেন, যাঁদের সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁদের কোন গতি হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।।২৫।।

যার প্রয়াণকালে ধূম আচ্ছন্ন হয়, যোগাগ্নি হয় (অগ্নি যজ্ঞ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অগ্নির স্বরূপ) কিন্তু ধূমদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, অবিদ্যার রাত্রি থাকে, অন্ধকার থাকে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমা ক্ষীণ হতে থাকে, কালিমার বাহুল্য থাকে, ষড়বিকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর) যুক্ত দক্ষিণায়ন অর্থাৎ বহির্মুখী হয় (যে পরমাত্মা

থেকে এখনও দূরে) সেই যোগীকে পুনরায় জন্ম নিতে হয়, তাহলে কি দেহের সঙ্গে সেই যোগীর সাধনা নষ্ট হয়ে যায়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ।।২৬।।

উপর্যুক্ত শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুই প্রকারের গতি জগতে শাশ্বত অর্থাৎ সাধনের কখনও বিনাশ হয় না। এক (শুক্ল) অবস্থাতে প্রয়াণ করেন যিনি, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন এবং অন্য অবস্থাতে, যার মধ্যে ক্ষীণ প্রকাশ এবং কালিমা বাকী থাকে, এইরূপ অবস্থাতে প্রয়াণ করেন যিনি, তাঁকে পুনরায় দেহধারণ করতে হয়। যতক্ষণ পূর্ণ প্রকাশ লাভ না হয়, ততক্ষণ ভজন করবার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। এখন এর জন্য সাধনের উপর পুনরায় জোর দিলেন–

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

তস্মাৎসর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।। ২৭।।

হে পার্থ! এইরূপ উভয় মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোন যোগী মোহগ্রস্ত হন না। তিনি জানেন যে পূর্ণ প্রকাশ লাভ হলে ব্রহ্মকে লাভ করবেন এবং ক্ষীণ প্রকাশ থাকলেও পুনর্জন্মে সাধনের নাশ হয় না। দুটি গতিই শাশ্বত। অতএব অর্জুন! তুমি সবকালে যোগেযুক্ত হও অর্থাৎ নিরন্তর সাধন কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।

অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।। ২৮।।

যোগী পুরুষ সাক্ষাৎকার করে এইরূপ অবগত হয়ে (স্বীকার করে নয়) বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের পুণ্যফলগুলিকে নিঃসন্দেহে অতিক্রমণ করেন এবং সনাতন পরমপদ লাভ করেন। অবিদিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ জানার নাম বেদ। সেই অবিদিত তত্ত্ব অবগত হলে, কি জানা বাকী থাকে? অতএব সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার পরে বেদের প্রয়োজন থাকে না; কারণ যিনি অবগত, তিনি এখন ভিন্ন নন। যজ্ঞ অর্থাৎ আরাধনার

নিয়ত ক্রিয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যখন এই তত্ত্ব সম্বন্ধে এখন অবগত, তখন কার জন্য ভজন করা হবে? মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে লক্ষ্যের অনুরূপ তৈয়ার করাই তপস্যা। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির পরে যোগী কার জন্য তপস্যা করবেন? মন, বচন ও কর্মদ্বারা সর্বতোভাবে সমর্পণের নাম দান। এই সমস্তের পুণ্যফল হল—পরমাত্মার প্রাপ্তি। ফল এখন পৃথক্ নেই, সেইজন্য এই সবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। সেই যোগী যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদির ফলকেও অতিক্রম করেন। তিনি পরমপদ লাভ করেন।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে পাঁচটি প্রমুখ বিষয়ের উপর বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সর্বপ্রথম সপ্তম অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণদ্বারা বীজারোপিত প্রশ্নগুলিকে স্পষ্টভাবে বোঝাবার আগ্রহে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন সাতটি প্রশ্ন করেছেন যে– ভগবন্! আপনি যাঁর সম্বন্ধে বললেন সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? সম্পূর্ণ কর্ম কি? অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ কাকে বলে? এবং শেষ সময়ে আপনি কিরূপে স্মৃতিতে জেগে থাকেন যে, আর কখনও বিস্মৃত হন না? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যাঁর কখনও বিনাশ হয় না সেই পরব্রহ্ম। 'স্বয়ং'- এর উপলব্ধিযুক্ত পরমভাবই অধ্যাত্ম। যার ফলে জীব মায়ার আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার আধিপত্যে চলে আসে তাই অধ্যাত্ম এবং ভূতগণের সেই সমস্তভাব, যা শুভ অথবা অশুভ সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই সমস্ত ভাব স্থির হওয়া '**বিসর্গঃ**'- লোপ পাওয়া কর্মের সম্পূর্ণতা। এর পরে কর্ম করবার প্রয়োজন হয় না। অতএব কর্ম শুভাশুভ সংস্কারের উদ্‌গমকেই বিনষ্ট করে দেয়।

এইরূপে ক্ষরভাব অধিভূত অর্থাৎ ভূতগণের উৎপত্তির মাধ্যম বিনাশশীল ভাব। সেগুলিই ভূতগণের অধিষ্ঠাতা। পরমপুরুষই অধিদৈব। সমস্ত দৈবী সম্পদ্ তাঁতে বিলীন হয়। এই দেহে অধিযজ্ঞ আমি অর্থাৎ যজ্ঞ যাতে বিলীন হয়, তা আমি, যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা আমি। যোগী আমার স্বরূপ লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। অধিযজ্ঞ যিনি, তিনি এই দেহেই বাস করেন, বাইরে নয়।

শেষ প্রশ্নটি ছিল যে, শেষ সময়ে কিরূপে আপনাকে জানা যায়? তিনি বললেন যে, যিনি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমার অতিরিক্ত অন্য কোন

বিষয়-বস্তুর চিন্তনকে মনে ঠাঁই দেন না এবং এইরূপ আচরণ করে দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তিনি সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, শেষ সময়েও তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগ করবার পরেই এই উপলব্ধি হবে এমন কথা নয়। যদি মৃত্যুর পরে এই স্থিতি লাভ হত, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হতেন না। বহুজন্ম ধরে যে পথিক চলে আসছেন ও লাভ করছেন, সেই জ্ঞানী তাঁর স্বরূপ হতেন না। সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে মন নিরুদ্ধ এবং এই নিরুদ্ধ মনেরও বিলয়ই হ'ল অন্তকাল। তবেই এই দেহের উৎপত্তির মাধ্যম শান্ত হয়ে যায়। সেই সময় পরমভাব-এ প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। যিনি এইরূপ স্থিতিলাভ করেছেন, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।

এইরূপ প্রাপ্তির জন্য তিনি স্মরণের বিধান বললেন যে, অর্জুন! নিরন্তর আমার স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। এই দুটি কাজ একসঙ্গে করা কি করে সম্ভব? কদাচিৎ এরূপ হবে যে, 'জয় গোপাল, হে কৃষ্ণ' বলে বলে লাঠি চালনাও করা হবে। এখানে স্মরণের স্বরূপ স্পষ্ট করলেন যে, যোগধারণাতে স্থির থেকে, আমাকে ছাড়া অন্য কোন বস্তুর স্মরণ না করে, নিরন্তর স্মরণ কর। স্মরণ যখন এত গভীর, তখন যুদ্ধ কিভাবে সম্ভব? মনে করুন এই পুস্তকটি ভগবান, আপনি যখন তার ধ্যান করবেন তখন যেন এর আশে-পাশের বস্তু, সম্মুখে যেগুলি আছে সেগুলির, বা অন্য দেখা-শোনা কোন বস্তুর চিন্তণ যেন মনে না ওঠে, এই সমস্ত যেন আপনি দেখতে না পান। যদি দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে ঠিকভাবে স্মরণ হচ্ছে না, এইরূপ স্মরণে যুদ্ধ কি করে হবে? বস্তুতঃ যখন আপনি নিরন্তর স্মরণে প্রবৃত্ত হবেন, তখনই যুদ্ধের যথার্থ স্বরূপ প্রকট হবে। সেই সময় মায়াময় প্রবৃত্তি বাধারূপে উপস্থিত হবে। কাম, ক্রোধ, রাগ দ্বেষ এরা দুর্জয় শত্রু। এই শত্রুগুলি স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে। এদের পার করে যাওয়াই যুদ্ধ। এই শত্রুদের নাশ করলেই যোগীপরমগতি লাভ করেন।

এই পরমগতি লাভ করবার জন্য অর্জুন! তুমি 'ওঁ' জপ কর এবং ধ্যান আমার কর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। নাম ও রূপ আরাধনার চাবিকাঠি।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই জিজ্ঞাসার সমাধান করলেন যে পুনর্জন্ম কি? কারা এর অন্তর্গত? তিনি বললেন, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যাবন্মাত্র জগৎ পুনরাবর্তী নিয়মের অন্তর্ভুত এবং এদের সমাপ্তির পরেও আমার পরম অব্যক্ত ভাব এবং তাতে স্থিতি সমাপ্ত হয় না।

এই যোগে প্রবিষ্ট পুরুষের গতি দুটি। যিনি পূর্ণপ্রকাশ প্রাপ্ত ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং ঊর্ধর্বরেতা, যাঁর মধ্যে লেশমাত্রও ত্রুটি নেই, তিনি পরমগতি লাভ করেন। যদি ঐ যোগকর্তার মধ্যে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে, কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় কালিমার সঞ্চার দেখা যায়, এইরূপ অবস্থাতে যাঁর দেহের সময় পূর্ণ হয় সেই যোগীকে জন্ম নিতে হয়। তিনি সামান্য জীবের মত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়ান্ না, জন্ম নিয়ে বাকী সাধনা সম্পূর্ণ করেন।

এইরূপে পরের জন্মে সেই ক্রিয়ার আচরণ করে তিনিও সেখানেই পৌঁছান, যার নাম পরমধাম। এর পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এর যৎসামান্য সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে। "উভয় পথই শাশ্বত অর্থাৎ অচল।" এই যথার্থকে বুঝে পুরুষ যোগ থেকে ভ্রষ্ট হন না। অর্জুন! তুমি যোগী হও। যোগী বেদ, তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানের পুণ্য ফলকে লঙ্ঘন করে যান, পরমগতি প্রাপ্ত হন।

বর্তমান অধ্যায়ে পরমগতির উল্লেখ কয়েকবারই করা হয়েছে। যাকে অব্যক্ত, অক্ষয় এবং অক্ষর বলে সম্বোধিত করা হয়েছে, যা কখনও ক্ষয় অথবা বিনাশ হয় না। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'অক্ষরব্রহ্মযোগো' নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।৮।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সংবাদে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'অক্ষরব্রহ্মযোগো' নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।৮।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।